কোয়ান্টাম কমপিউটিংয়ের অগ্রনায়কদের হাতে নোবেল পুরস্কার

গোলাপ মুনীর

পদার্থবিদ্যায় ২০১২ সালের নোবেল পুরস্কার পেলেন কোয়ান্টাম কমপিউটিংয়ের দুই অগ্রনায়ক : ফ্রান্সের সার্জ হ্যারোস ও যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড। কোয়ান্টাম কণা নিয়ে, কিংবা বলা যায় কোয়ান্টাম অপটিকস তথা আলোকবিদ্যা নিয়ে গবেষণায় অনন্য-সাধারণ সাফল্যের জন্য তাদেরকে এবার যৌথভাবে এই নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এই দুই বিজ্ঞানী আলাদা আলাদাভাবে গবেষণা করে দেখিয়েছেন, কিভাবে আলোর কণাকে এর একেবারে মৌলিক অবস্থানে অর্থাৎ কোয়ান্টাম স্টেটে রেখে এর কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল প্রকৃতি বদল না করে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যা আগে অসম্ভব বলে মনে করা হতো। বস্তু ও আলো যখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একক কণায় পৌঁছায়, তখন তাদের আচরণ হয় অদ্ভুত ধরনের। আর তা পরিমাপ কিংবা পর্যবেক্ষণের কাজটি শুধু গাণিতিক হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে তত্ত্বগতভাবে সম্ভব ছিল। এটি পুরোপুরি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিষয়। এখন এই দুই বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম কণা নিয়ন্ত্রণ করেই তাদের পরিমাপ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং তা কাজে লাগানোর উপায় আবিষ্কার করেছেন। এটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার এক অসাধারণ অগ্রগতি। কারণ, তাদের আবিষ্কারের ফলে এখন এমন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কোয়ান্টাম কমপিউটার তৈরি করা সম্ভব হবে, যা এতদিন ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে।

প্রতি বছর বিভিন্ন বিষয়ে কাকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হবে, তা নির্বাচন করে রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স। এই দুই বিজ্ঞানীকে পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী ঘোষণা করে দেয়া বিবৃতিতে এই অ্যাকাডেমি বলেছে– 'কোয়ান্টাম কণা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেছেন সার্জ হ্যারোস ও ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড। বিশেষ কোনো কোয়ান্টাম কণা নিয়ন্ত্রণ করেই এর পরিমাপের উপায় বের করেছেন এরা। বর্তমানে ব্যবহারের কমপিউটার গত শতাব্দীতে যেমন আমাদের জীবনযাত্রা আমূল পাল্টে দিয়েছে, ঠিক তেমনি বর্তমান শতাব্দীতে সেই একই ঘটনা ঘটাতে পারে কোয়ান্টাম কমপিউটার।'

আজকের দিনের কমপিউটার কাজ করে বাইনারি পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে শূন্য (০) আর এক (১) বিট হিসেবে যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম কমপিউটার কাজ করবে কোয়ান্টাম বিট বা কিউবিট ব্যবহার করে। এখানে একই সাথে 'শূন্য' অথবা 'এক' উভয় পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। এর ফলে একটি কমপিউটারের তথ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যাবে। সোজা কথায় কমপিউটারের কাজের ক্ষমতা অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যাবে। এ ছাড়া এ দুই বিজ্ঞানীর কাজের ফলে এমন ঘড়ি তৈরি করা সম্ভব হবে, যা বর্তমানের সিজিয়াম ঘড়ির চেয়ে শতগুণ নিখুঁত সময় দেবে।

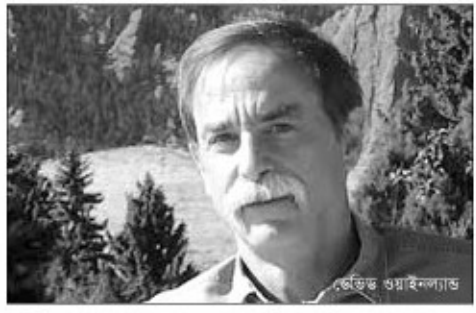
ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড

সার্জ হ্যারোস

আমরা বলতে পারি পদার্থবিদ্যায় এবারের নোবেল বিজয়ী এই দুই বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম কমপিউটারে এক নতুন বিপ-বের পথ খুলে দিলেন। সেই সাথে কোয়ান্টাম কমপিউটিংয়ের সাফল্যের ইতিহাসে নিজেদের করলেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

কোয়ান্টাম জগতে কণা নিয়ন্ত্রণ

এরই মধ্যে আমরা জানলাম, কেনো সার্জ হ্যারোস ও ডেভিড ওয়াইনল্যান্ডকে ২০১২ সালের জন্য পদার্থবিদ্যায় যৌথভাবে নোবেল বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– এ দুই বিজ্ঞানী স্বতন্ত্রভাবে একটি অসাধারণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এ পদ্ধতিতে পদার্থের মৌল কণাকে অর্থাৎ পার্টিকেলকে এর কোয়ান্টাম-মেকানিক্যাল প্রকৃতি বদল না করেই পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এবং প্রয়োজনমতো তাকে কাজে লাগানো যায়।

এই উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের মাধ্যমে এ দুই বিজ্ঞানী যেমনি কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় নতুন এক দুয়ার উন্মোচন করেছেন, তেমনি উন্মোচন করেছেন কোয়ান্টাম কমপিউটিংয়ের জগতে নতুন আরেক বিপ-বের পথ। এর মাধ্যমে এরা পরীক্ষাগারে দেখিয়েছেন, একটি কণাকে ধ্বংস না করে সরাসরি তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। এদের নিজস্ব ল্যাবরেটরি মেঘডে এরা কণার মৌলিক অবস্থানে অর্থাৎ কোয়ান্টাম স্টেটে কণা পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের এই গবেষণা সাফল্যের সূত্রে নতুন ধরনের অতি দ্রুতগতির কমপিউটার, অর্থাৎ সুপার-ফাস্ট কমপিউটার তৈরির পথে আমরা আরো একধাপ এগিয়ে গেলাম। আর এ সুপার-ফাস্ট কমপিউটার তৈরি হবে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে, যা এই দুই নোবেল বিজয়ী আমাদের উপহার দিলেন তাদের কর্ম-সাধনার মাধ্যমে শুধু তাই নয়, তাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে আমরা আরো সঠিক ও যথার্থ সময় দিতে সক্ষম ঘড়ি তৈরি করতে পারব, যে ঘড়ি আজকের দিনের সিজিয়াম ঘড়ির ▶

তুলনায় শতগুণ সঠিক সময় আমাদের জানাবে। এর ফলে সূচিত হবে নতুন প্রমিত সময়-ব্যবস্থা।

আলোর অথবা পদার্থের একক কণার ক্ষেত্রে প্রচলিত পদার্থবিদ্যার অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের সূত্র বা নিয়ম-কানুন আর কাজ করে না। এ ক্ষেত্রে দায়িত্বটা পড়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ওপর। কিন্তু একক কণাগুলো (Single Particles) এর চারপাশের পরিবেশ থেকে সহজে আলাদা করা হয় না বা যায় না। এরা এদের রহস্যময় কোয়ান্টাম গুণাগুণ ঠিক তখনই হারিয়ে ফেলে, যখন এরা বাইরের দুনিয়ার সাথে আন্তঃক্রিয়া করে। সেজন্য কোয়ান্টাম মেকানিকস বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা যেসব অদ্ভুত ধরনের প্রপঞ্চ (bizarre phenomena) সম্পর্কে পূর্বাভাষ দেয়া হয়েছিল, তা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায়নি। গবেষকেরা সক্ষম হয়েছেন শুধু 'thought experiments' তথা ভাবনা-চিন্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে, যা নীতিগতভাবে হয়তো প্রদর্শন করতে পেরেছে এসব প্রপঞ্চ বা অনুমিত সত্য। কিন্তু এবারের পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী এই দুই বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম অপটিকস বা আলোকবিদ্যার জগতে গবেষণা করেছেন আলো (light) ও পদার্থের (matter) মধ্যকার আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি। তাদের এ গবেষণার ক্ষেত্রটিতে ১৯৮০-র দশকের পরবর্তী সময়ে তেমন কোনো অগ্রগতি ছিল না। তাদের গবেষণা-সাফল্য এ ক্ষেত্রে সূচনা করল বড় ধরনের এক অগ্রগতি। তাদের গবেষণার মধ্যে অনেক কিছুই রয়েছে একই ধরনের। ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড ধরতে পেরেছেন বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত অণুগুলো (electrically charged atoms) বা আয়নগুলো (ions) নিয়ন্ত্রণ এবং এগুলোকে পরিমাপ করেছেন আলো বা ফোটন দিয়ে। সার্জ হ্যারোস কাজটি করেছেন উল্টো দিক থেকে। তিনি ধরে রাখা ফোটনগুলো বা আলোর কণাগুলো (particles of light) নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপ করেছেন কণা ধরার ফাঁদে অণু পাঠিয়ে।

ফাঁদে একক আয়ন নিয়ন্ত্রণ

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের বোল্ডারে রয়েছে ডেভিড ওয়াইনল্যান্ডের ল্যাবরেটরি। তার ল্যাবরেটরিতে বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত অণু বা আয়নগুলোকে রাখা হয় একটি ট্র্যাপ বা ফাঁদে। এ কাজটি করা হয় এর চারপাশে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করে। কণাগুলোকে আলাদা করা হয় এগুলোর চারপাশের পরিবেশের আলো ও বিকিরণ থেকে। এ জন্য পরীক্ষাটি তিনি চালান একটি চরম কম তাপমাত্রার সম্পূর্ণ ফাঁকা বা শূন্য স্থানে, যে স্থানে কোনো পদার্থ এমনকি বায়ুও ঢুকতে পারে না।

ওয়াইনল্যান্ডের গবেষণার অগ্রগতির পেছনের গোপন রহস্যগুলোর একটি হচ্ছে লেজার রশ্মির ব্যবহার ও লেজার পালস সৃষ্টির শৈল্পিক দক্ষতা। একটি লেজার ব্যবহার করা হয় ফাঁদের ভেতরের আয়নের তাপীয় গতি বা থার্মাল মোশন অবদমনের জন্য। এভাবে আয়নটিকে সবচেয়ে কম এনার্জির অবস্থায় রাখা হয়। এর ফলে ফাঁদে আটকানো নিয়ন্ত্রিত আয়নের কোয়ান্টাম ফেনোমেনা বা অনুমিত সত্যগুলো পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। সতর্কতার সাথে লেজার পালস ব্যবহার করা যায় আয়নটিকে superposition অবস্থায় রাখার জন্য, যেখানে একই সময়ে অস্তিত্বশীল থাকে দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থা। উদাহরণ টেনে বলা যায়– আয়নকে প্রস্তুত করা যাবে একই সাথে আলাদা দু'টি মাত্রার শক্তি (two different energy levels simultaneously) অর্জন বা দখলের জন্য। এর শুরু হয় সবচেয়ে কমমাত্রায় এনার্জি নিয়ে এবং লেজার পালস উচ্চতর এনার্জিতে যাওয়ার আঘাতপথে আয়নে আঘাত করে, যাতে তা দুই এনার্জি লেভেলের মাঝামাঝি থেকে যায়। এটাই হচ্ছে আয়নের সুপারপজিশন স্টেট বা অবস্থা। এখানে সমপরিমাণ সম্ভাব্যতা রয়েছে এর যেকোনো একটি নিদর্শেষিত হয়ে যাওয়ার। এভাবে একটি আয়নের এনার্জির অবস্থা একটি কোয়ান্টাম সুপারপজিশনে পর্যবেক্ষণ সম্ভব।

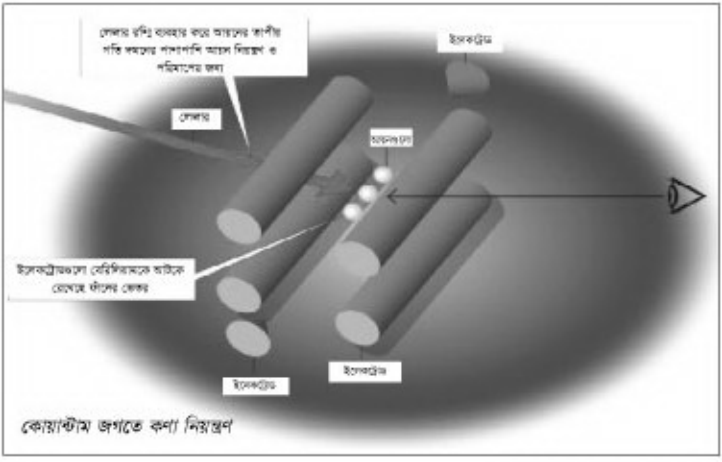

কোয়ান্টাম জগতে কণা নিয়ন্ত্রণ

ফাঁদে একক ফোটন নিয়ন্ত্রণ

সার্জ হ্যারোস ও তার গবেষণাদল কোয়ান্টাম জগতের রহস্য উদঘাটনে কাজে লাগান আলাদা এক পদ্ধতি। তার প্যারিসের ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোওয়েভ ফোটন ফিরে আসে এবং বরাবর চলে যায় দু'টি আয়নের মধ্যকার ছোট্ট গর্তে। আয়ন দু'টি রাখা হয় ৩ সেন্টিমিটার দূরত্বে। আয়নগুলো তৈরি অতিপরিবাহী অর্থাৎ সুপারকন্ডাক্টিং পদার্থ দিয়ে। আয়নগুলোকে ঠাণ্ডা করা হয় চরম শূন্য তাপমাত্রারও নিচের তাপমাত্রায়। এই সুপারকন্ডাক্টিং আয়নগুলো হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল। এগুলো রিফ্লেকটিভও। ফলে একটি একক ফোটন এগুলো থেকে ফিরে এসে উল্টি-খিত গর্তে ঢুকতে পারে– এক সেকেন্ডের এক-দশমাংশ সময়ের মধ্যে তা ধ্বংস কিংবা শোষিত হওয়ার আগেই। এই রেকর্ড-পরিমাণ দীর্ঘ জীবন-সময়ের (লাইফ-টাইম) অর্থ হচ্ছে, ফোটন পরিভ্রমণ করবে ৪০ হাজার কিলোমিটার, যা পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরে আসার সমান।

এর সুদীর্ঘ লাইফ টাইমে ফাঁদে আটকা ফোটনকে নানা কোয়ান্টাম ফর্মে ব্যবহার করা যাবে। হ্যারোস ব্যবহার করেন বিশেষভাবে তৈরি অণু অর্থাৎ স্বল্পদৈর্ঘ্য তরঙ্গের ফোটন নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপের উদ্ভয় কাজে। একটি রিডবার্গ অণুর ব্যাসার্ধ হচ্ছে ১২৫ ন্যানোমিটার, যা মোটামুটিভাবে একটি টাইপিক্যাল অ্যাটমের তুলনায় ১ হাজার গুণ বড়। এই রিডবার্গ অ্যাটমগুলো সতর্কতার সাথে একটার পর একটা উল্টি-খিত গর্তে পাঠানো হয় নির্দিষ্ট গতিতে, যাতে করে মাইক্রোওয়েভ ফোটনের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া চলে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে। এই রিডবার্গ অ্যাটমে মাইক্রোওয়েভ ফোটন পেছনে ফেলে রেখে উল্টি-খিত গর্তে গিয়ে অস্তিত্বশীল হয়। কিন্তু ফোটন ও অ্যাটমের মধ্যকার আন্তঃক্রিয়া অণুর কোয়ান্টাম পরিস্থিতির পর্যায়ে একটা পরিবর্তন সৃষ্টি করে। আপনি যদি অণুর কোয়ান্টাম পরিস্থিতিকে একটা তরঙ্গ বা ওয়েভ হিসেবে ভাবেন, তবে তরঙ্গের উত্থান ও পতনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে। এই পর্যায় পরিবর্তন (পেইজ শিফট) পরিমাপ করা যাবে, যখন অণু অস্তিত্বশীল থাকবে ওই গর্তে। এর ফলে এ থেকে জানা যাবে গর্তের ভেতরে ফোটনের উপস্থিতি থাকা না থাকা। কোনো ▸

ফোটন না থাকলে কোনো পর্যায় বা পেইজের পরিবর্তন ঘটেনি। অতএব হ্যারোস এভাবে পরিমাপ করতে পেরেছেন একটি একক ফোটন, একে কোনো ধরনের ধ্বংস না করেই।

একই ধরনের একটি পদ্ধতিতে সার্জ হ্যারোস ও তার গবেষকদল গর্তের মধ্যকার ফোটনগুলো গণনা করতে পেরেছেন। ঠিক এভাবে শিশু যেভাবে একটি পাত্রে রাখা মার্বেল গুনতে পারে। কথাটা শুনতে খুব সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে প্রয়োজন অনন্য-সাধারণ নিপুণতা ও দক্ষতা। কারণ, ফোটন আমাদের সাধারণ মার্বেলের মতো কিছু নয়। ফোটন বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসামাত্র ধ্বংস হয়ে যায়। ফোটন গণনার পদ্ধতি গড়ে তোলায় হ্যারোস ও তার সহযোগীরা এমনসব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন, যা রিয়েল টাইমে ধাপে ধাপে অনুসরণ করে একেকটি কোয়ান্টাম পরিস্থিতিকে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্যারাডক্স

প্যারাডক্স বলতে আমরা বুঝি এমন কিছু বিষয়কে, যা আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী মনে হলেও সত্যবিরোধী নয়। এখানে কোয়ান্টাম মেকানিকস তথা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটি প্যারাডক্সের কথাই উলে-খ করা হচ্ছে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বর্ণনা করে এক অণুজগতের (microscopic world) কথা, যা আমরা খোলা চোখে দেখতে পাই না। এই অণুজগতে এমনসব ঘটনা ঘটে, যা আমাদের প্রত্যাশা ও অভিজ্ঞতার বাইরে। এই অপ্রত্যাশিত ও অনভিজ্ঞতা আচরণের একটি উদাহরণ হচ্ছে 'সুপারপজিশন', যেখানে কোয়ান্টাম কণা একই সময়ে থাকতে পারবে বেশ কয়েকটি অবস্থায়। সাধারণত আমরা ভাবতে পারি না একটি মার্বেল একই সময়ে 'এখানে' ও 'সেখানে' থাকবে। কিংবা একটি মার্বেল একই সময়ে 'গরম' এবং 'ঠাণ্ডা' থাকতে পারে– তেমনটিও ভাবতে পারি না। কিন্তু মার্বেলটিকে যদি নিয়ে যাওয়া যায় কোয়ান্টাম জগতে, তবে মার্বেলটি এক সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে। মার্বেলটির 'সুপারপজিশন স্টেট' আমাদের বলে দেবে মার্বেলটি একই সময়ে 'এখানে' ও 'সেখানে' থাকার সম্ভাবনাটি কী?

আমরা এর আগে কেনো কোয়ান্টাম জগতের এই অদ্ভুত উদ্ভয় দিকটি সম্পর্কে সচেতন হতে পারিনি? কেনো আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কোয়ান্টাম মার্বেলের এই সুপারপজিশনে প্রত্যক্ষ করি না? অস্ট্রিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী ১৯৩৩ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী এরউইন শ্রোডিঙ্গার এই প্রশ্ন নিয়ে লড়াই করেছেন। কোয়ান্টাম তত্ত্বের আর সব অগ্রনায়কদের মতো তিনি অবিরাম কাজ করেছেন এর প্রভাব বুঝতে এবং ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য। শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালে তিনি লিখলেন : 'We never experiment with just one electron or atom or (small) molecule. In thought-experiments we some times assume that we do; this invariably entails ridiculous consequences...' (অর্থাৎ 'আমরা কখনই পরীক্ষা করিনি একটি মাত্র ইলেকট্রন, অথবা অণু, অথবা (ছোট্ট) পরমাণু নিয়ে। ভাবনা–পরীক্ষায় আমরা কখনো কখনো ধরে নিই, আমরা তা করি। আর তা অপরিবর্তনীয়ভাবে চাপিয়ে দেয় হাস্যকর পরিণতি...।)

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ক্ষুদ্রজগৎ (micro-world) এবং আমাদের প্রতিদিনের সামগ্রিক জগৎ (macro-world)-এর মধ্যে চলার অযৌক্তিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণতি ব্যাখ্যা করতে শ্রোডিঙ্গার বিড়াল নিয়ে একটি থট–এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা দিয়েছিলেন : শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল হচ্ছে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন বাক্সবন্দী একটি বিড়াল। বাক্সের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক সায়ানাইডের বোতল, যা কিছু তেজস্ক্রিয় অণুর মাধ্যমে ক্ষয় হওয়ার পর খুলে যায়। এই তেজস্ক্রিয় অণুটিও রয়েছে এই বাক্সের মধ্যেই। তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হয় কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়ম বা সূত্র মেনে। এই নিয়ম বা সূত্রগুলোর মতে, তেজস্ক্রিয় পদার্থটি রয়েছে সুপারপজিশন অবস্থায়, ক্ষয়িত (decayed) ও এখনো অক্ষয়িত (not yet decayed) অবস্থায়। অতএব বিড়ালটি অবশ্যই থাকতে পারে একটি সুপারপজিশন অবস্থায়, মৃত ও জীবিত অবস্থায়। এখন, আপনি যদি বাক্সের ভেতর উঁকি মারেন, তবে আপনাকে বিড়ালটি হত্যার ঝুঁকি নিতে হবে। কারণ, কোয়ান্টাম সুপারপজিশন অবস্থায় চারপাশের পরিবেশের সাথে আন্তঃক্রিয়ায় এতটাই স্পর্শকাতর যে, বিড়ালটি পর্যবেক্ষণের জন্য সামান্যতম চেষ্টা করলে cat-state (বিড়ালের অবস্থা) ভেঙে পড়বে অর্থাৎ কলাপস করবে। এর ফলে সম্ভাব্য দু'টি ফল দাঁড়াতে পারে : মৃত বিড়াল অথবা জীবিত বিড়াল। শ্রোডিঙ্গারের মতে, এই থট-এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা একটা অযৌক্তিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ উপসংহারে পৌঁছাতে পারি। এবং বলা হয়, পরবর্তী সময়ে তিনি এ ধরনের 'কোয়ান্টাম কনফিউশন' তৈরির জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন।

২০১২ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী এই দুই বিজ্ঞানীর উদ্ভয়ই 'কোয়ান্টাম ক্যাট-স্টেট' চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন, যখন এটি মুখোমুখি হয় বাইরের জগতের সাথে। এরা উদ্ভাবন করেছে সৃজনশীল পরীক্ষা এবং বিস্তারিতভাবে দেখাতে পেরেছেন, কিভাবে পরিমাপের কাজটি 'কোয়ান্টাম স্টেটের' ওপর প্রভাব ফেলে তা ধ্বংস করতে এবং এর সুপারপজিশন গুণাবলী হ্রাস করতে। শ্রোডিঙ্গারের বিড়ালের পরিবর্তে হ্যারোস ও ওয়াইনল্যান্ড কোয়ান্টাম কণাকে ফাঁদে আটকান এবং এই কণাকে বিড়ালের মতো একটি সুপারপজিশনে রাখেন। এই কোয়ান্টাম বস্তুগুলো বিড়ালের মতো ম্যাক্রোস্কোপিক নয়, অর্থাৎ বিড়ালের মতো বড় নয়। কিন্তু কোয়ান্টামের প্রমিত মাপে এগুলো তারপরও অনেক বড়।

হ্যারোসের গর্তের ভেতরে স্বল্পদৈর্ঘ্যের তরঙ্গের ফোটন (microwave Photon) বিড়ালের মতো অবস্থায় রাখা হয় একই সময়ে দু'টি পর্যায়ে (Phase)। যেমন এমন একটি স্টপওয়াচের মতো, যার কাঁটা একই সময়ে ঘড়ির কাঁটার দিকে ও বিপরীত

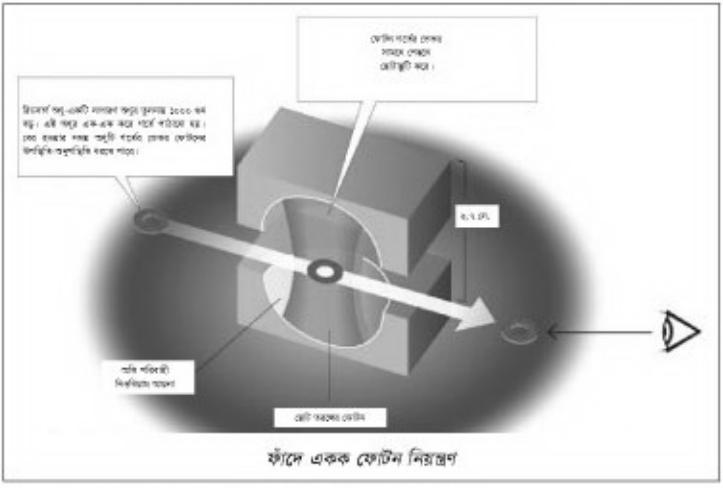

দিকে ঘুরে। গর্তের ভেতরের মাইক্রোওয়েভ ফিল্ড তখন অনুসন্ধান করা হয় রিডবার্গ অ্যাটম দিয়ে। এর ফল অবৃদ্ধিসুলভ intanglement নামের আরেকটি কোয়ান্টাম এফেক্ট এনটেঙ্গলমেন্টের বর্ণনা করে গেছে এরউইন শ্রোডিঙ্গারও এবং তা ঘটতে পারে দুই বা ততোধিক কোয়ান্টাম অণুর মধ্যে, যাদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ নেই। তারপরেও এদের পাঠ নেয়া সম্ভব হবে এবং তা একে অন্যের গুণাগুণের ওপর ক্ষতির প্রভাব ফেলতে পারে। সোজা কথায়, একে অন্যের গুণাগুণে পরিবর্তন আনতে পারে। মাইক্রোওয়েভ ফিল্ডের এনটেঙ্গলমেন্ট ও রিডবার্গ অ্যাটম হ্যারোসকে সুযোগ করে দিয়েছে। গর্তের ভেতর ক্যাট-লাইক অবস্থায় জীবন (life) ও মৃত্যু (death) চিহ্নিত করতে। তিনি এ কাজটি করেন ধাপে ধাপে, অ্যাটমের পর অ্যাটম নিয়ে।

নতুন কমপিউটার বিপ-বের দ্বারপ্রান্তে

আয়নকে কার্যত ফাঁদে আটকিয়েছেন এই দুই নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী। আয়নকে ফাঁদে আটকে নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন এরা, এর সম্ভাব্য একটি প্রয়োগ হবে কোয়ান্টাম কমপিউটার তৈরিতে। এ কোয়ান্টাম কমপিউটার হবে আজকের কমপিউটারের চেয়ে শত শত গুণ বেশি দ্রুত গতিসম্পন্ন ও কার্যক্ষম। এই মহাশক্তিধর কোয়ান্টাম কমপিউটারের স্বপ্ন বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন থেকে দেখে আসছেন। সার্জ হ্যারোস ও ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড গবেষণার সাফল্যসূত্রে আজ সেই মহাশক্তিধর কমপিউটার তৈরির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। সংশি-ষ্ট বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর ফলে কমপিউটিং জগতে নতুন এক বিপ-বের সূচনা ঘটতে যাচ্ছে।

আজকের দিনের প্রচলিত কমপিউটারে তথ্যের সবচেয়ে ছোট একক হচ্ছে বিট (bit), যার ভ্যালু ১ অথবা ০। কিন্তু কোয়ান্টাম কমপিউটারে তথ্যের মৌল একক হচ্ছে 'কোয়ান্টাম বিট' বা কিউবিট (qbit)। এর ভ্যালু হতে পারে একই সাথে ১ এবং ০। দু'টি কোয়ান্টাম বিট একই সাথে নিতে পারে চারটি ভ্যালু : ০০, ০১, ১০ এবং ১১। আর প্রতিটি অতিরিক্ত কিউবিট সম্ভাব্য অবস্থার (state) সংখ্যা দ্বিগুণ করতে পারে। 'ক' সংখ্যক

নোবেল বিজয়ীরা জাদুকরের মতো ফাঁদে অণু নিয়ন্ত্রণ করছেন

বিটের জন্য সম্ভাব্য অবস্থা বা স্টেটের সংখ্যা হতে পারে $২^{ক}$। মাত্র ৩০০ কিউবিট-সমৃদ্ধ কোয়ান্টাম কমপিউটারের কিউবিটগুলো একই সাথে ধারণ করতে পারে $২^{৩০০}$ বিট সম্ভাব্য স্টেট বা অবস্থা। আর এ সংখ্যা মহাবিশ্বের অণুর সংখ্যার চেয়েও বেশি।

ওয়াইনল্যান্ডের গবেষক দলই বিশ্বের প্রথম গবেষক দল, যে দলটি দু'টি কোয়ান্টাম বিট নিয়ে এর কোয়ান্টাম অপারেশন প্রদর্শন করতে পেরেছে। যেহেতু সামান্য-সংখ্যক কিউবিট নিয়ে নিয়ন্ত্রিত অপারেশন ইতোমধ্যেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, অতএব নীতিগতভাবে এমনটি ভাবার কোনো অবকাশ নেই যে, অধিকসংখ্যক কিউবিট নিয়ে এ ধরনের অপারেশন চালানো যাবে না। তা সত্ত্বেও এ ধরনের কোয়ান্টাম কমপিউটার তৈরি একটা বড় ধরনের প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ। এর জন্য প্রয়োজন দু'টি বড় ধরনের কাজ :
কিউবিটগুলোকে এর চারপাশের জগৎ থেকে পর্যাপ্তভাবে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, যাতে করে এগুলোর কোয়ান্টাম গুণাগুণ কিছুতেই বিনষ্ট না হয়। এরপরও এগুলোকে সক্ষম হতে হবে বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ রক্ষায়, যাতে করে তাদের পরিমাপের ফল বাইরে পাঠানো যায়। সম্ভবত এ শর্তকেই কোয়ান্টাম কমপিউটার তৈরি করা যাবে। যদিও তা সম্ভব হয়, তবে আমাদের প্রতিদিনের জীবন পাল্টে যাবে অভাবনীয়ভাবে। ঠিক যেভাবে বিগত জগতে প্রচলিত কমপিউটার আমাদের জীবনে এনে দিয়েছিল বৈপ-বিক এ পরিবর্তন।

নতুন ঘড়ি

ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড ও তার গবেষক দল ফাঁদে আটকানো আয়নকে ব্যবহার করেছেন একটি ঘড়ি তৈরির কাজে। এই ঘড়িটি সিজিয়াম-ভিত্তিক অ্যাটমিক ঘড়ির তুলনায় ১০০ গুণ সঠিক সময় দেয়। এটি এখন আমাদের সময়ের প্রমিত মান হিসেবে বিবেচিত। একটি প্রমিত (স্ট্যান্ডার্ড) মানের বিপরীতে সব ঘড়ি দিয়ে সেটিং বা সিনক্রোনাইজ করে সময় ধারণ করা হয়। সিজিয়াম ঘড়ি চলে মাইক্রোওয়েভ রেঞ্জে, অপরদিকে ওয়াইনল্যান্ডের আয়ন ঘড়ি ব্যবহার করে দৃশ্যমান আলো– এ জন্য এগুলোর নাম : অপটিক্যাল ক্লক বা আলোক ঘড়ি। একটি অপটিক্যাল ক্লকে থাকতে পারে একটি মাত্র আয়ন কিংবা দু'টি আয়ন ফাঁদে আটকানো অবস্থায়। দু'টি আয়নের একটি আয়ন ব্যবহার হয় ঘড়ি হিসেবে, অন্যটি ব্যবহার হয় ঘড়িটি পাঠ করতে এর অবস্থার পরিবর্তন না করেই। অপটিক্যাল ক্লকের সময়ের যথার্থতা $১০^{-১৭}$-এর একভাগের চেয়েও বেশি। এর অর্থ হলো কেউ যদি পৃথিবীর সৃষ্টির সেই বিগ ব্যাংয়ের সময় থেকে অপটিক্যাল ঘড়ি দিয়ে সময় গণনা শুরু করতেন, তবে আজ পর্যন্ত এর সময়ের একটি হতো সর্বোচ্চ ▸

কোয়ান্টাম ক্যাট-স্টেট

৫ সেকেন্ড।

এতটুকু যথার্থ সঠিকভাবে সময়ের হিসাব বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নানা সূক্ষ্ম ও সুন্দর প্রপঞ্চ (অনুমিত সত্য) প্রত্যক্ষ করেছেন। এরা লক্ষ করেছেন সময় প্রবাহের পরিবর্তন, অভিকর্ষের ক্ষুদ্র বিভিন্নতা ও স্পেস-টাইমের বিকৃতি। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব মতে, সময়ের ওপর প্রভাব রয়েছে গতির ও অভিকর্ষের (motion and gravity)। স্পিড যত বাড়বে অভিকর্ষবল তত বেশি জোরদার হবে, এবং সময়ের প্রবাহে আসবে ধীর গতি। আমরা এসব প্রভাব সম্পর্কে সজাগ নাও থাকতে পারি, কিন্তু কার্যত এগুলো হতে পারে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ। আমরা যখন জিপিএস সিগন্যাল নেভিগেট করি, আমরা তখন টাইম সিগন্যালের ওপর নির্ভর করি। এই টাইম সিগন্যাল আসে ঘড়িওয়ালার উপগ্রহ থেকে, যার ক্রামাঙ্ক নিয়মিত নির্ণয় করা হয়। কারণ, গ্রাহিটি কয়েকশ' কিলোমিটার উপরের আকাশে কিছুটা কম। একটি অপটিক্যাল ঘড়ি দিয়ে সমস্ত প্রবাহের পার্থক্য মাপা সম্ভব, যখন ঘড়ির স্পিড প্রতি সেকেন্ডে ১০ মিটার পরিবর্তীত হয়।

কোয়ান্টাম কমপিউটার যেভাবে কাজ করে

কমপিউটার উৎপাদকদের অব্যাহত চেষ্টা : কী করে কমপিউটারের প্রসেসিং পাওয়ার বাড়ানো যায়। তাদের প্রচেষ্টার ফলে এরই মধ্যে এই প্রসেসিং পাওয়ার ব্যাপকভাবে বেড়েছেও। কিন্তু আমরা চাই কমপিউটারের আরো গতি। আমাদের সে চাহিদার যেনো শেষ নেই। অতএব দেখতে চাই আরো বেশি কমপিউটিং ক্যাপাসিটির কমপিউটার। আমেরিকান কমপিউটার প্রকৌশলী হাওয়ার্ড অ্যাইকান বলেছিলেন, মাত্র ছয়টি ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কমপিউটার যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক কমপিউটার চাহিদা মেটাতে পারবে। অন্যরাও একই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কমপিউটিং ক্ষমতা সম্পর্কে। তারা বলে গেছেন, কমপিউটার আমাদের ক্রমবর্ধমান প্রাযুক্তিক চাহিদা মেটাবে। কিন্তু আইকান হয়তো তখন বুঝতে পারেননি তথ্য প্রবাহের মাত্রাটা আজকের মতো এতটা ব্যাপক পর্যায়ে উঠে আসবে এবং আমাদের কমপিউটিং ক্যাপাসিটির চাহিদাটাও এত বেশি মাত্রায় বেড়ে যাবে।

আমরা কি কখনো শুনেছি আমাদের কমপিউটারের ক্ষমতা বা চাহিদা কতটুকু হবে? মুর'স ল' বলে, একটি মাইক্রো প্রসেসরের ট্রানজিস্টরের সংখ্যা প্রতি ১৮ মাসে দ্বিগুণ হবে। তাই যদি হয় তবে ২০২০ অথবা ২০৩০ সালে একটি মাইক্রো প্রসেসরের সার্কিট মাপতে হবে আণবিক স্কেলে। এবং পরবর্তী যৌক্তিক পদক্ষেপ হবে 'কোয়ান্টাম কমপিউটার' তৈরি করা, যা অণু-পরমাণুর (atoms and molecules) শক্তি ত্বরান্বিত করবে মেমরি ও প্রসেসিংয়ের কাজ সম্পাদনের জন্য। কোয়ান্টাম কমপিউটারের সক্ষমতা রয়েছে যেকোনো সিলিকনভিত্তিক কমপিউটারের চেয়ে উলে-খ্যযোগ্যভাবে দ্রুতগতিতে কমপিউটিং সম্পাদনের। বিজ্ঞানীরা এরই মধ্যে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন কোয়ান্টাম কমপিউটার, যা সুনির্দিষ্ট কিছু ক্যালকুলেশন করতে সক্ষম। তবে একটি প্র্যাকটিক্যাল কোয়ান্টাম কমপিউটার করতে আরো কিছু বছর লাগবে।

কোয়ান্টার কমপিউটারের সংজ্ঞায়ন

১৯৩০-এর দশকে অ্যালান তুরিং উদ্ভাবন করেন 'তুরিং মেশিন'। এটি একটি তাত্ত্বিক যন্ত্র। এতে রয়েছে অসীম লম্বা একটি ফিতা (tape) এবং এই ফিতাটি ছোট ছোট বর্গে বিভক্ত। প্রতিটি বর্গ ধারণ করতে পারে একটি করে সঙ্কেত : ১ অথবা ০। কিংবা কোনো সঙ্কেত ধারণ না করেই থাকতে পারে ফাঁকা। একটি read-write ডিভাইস এই সঙ্কেতগুলোর সঙ্কেত ও ফাঁকাগুলো রিড করতে পারে। এই রিড-রাইট ডিভাইসটি সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুসরণ করার নির্দেশ দেয় তুরিং মেশিনকে। বিষয়টি কি সুপরিচিত মনে হয় না? ঠিক আছে, একটি কোয়ান্টাম তুরিং মেশিনে পার্থক্যটা হচ্ছে, এই ফিতাটি থাকে একটি কোয়ান্টাম অবস্থায় অর্থাৎ কোয়ান্টাম স্টেটে। তেমনি থাকে রিড-রাইট হেড। এর অর্থ হচ্ছে, এর ফিতার উপরের সঙ্কেতগুলো ১ বা ০ হতে পারে, অথবা হতে পারে ১ ও ০-এর সুপারপজিশন। অন্য কথায়, সঙ্কেতটি একই সময়ে একযুগে হতে পারে ১ ও ০ উভয়ই (এবং এদের মধ্যেবর্তী যেকোনো পয়েন্ট)। অপরদিকে একটি নরমাল তুরিং মেশিন একবারে শুধু একটি ক্যালকুলেশনেই করতে পারে। আর একটি কোয়ান্টাম তুরিং মেশিন একই সময়ে করতে পারে অনেকগুলো ক্যালকুলেশন।

আজকের দিনের কমপিউটার হচ্ছে সাধারণ তুরিং মেশিনের মতো। এগুলো কাজ করে বিটকে (bit) কাজে লাগিয়ে, যা অস্তি ত্বশীল দু'টি অবস্থায় ০ অথবা ১। কোয়ান্টাম কমপিউটার দু'টি অবস্থার মধ্যে সীমিত নয়। কোয়ান্টাম কমপিউটার ইনফরমেশন এনকোড করে কোয়ান্টাম বিট বা কিউবিট (qbit) হিসেবে, যা অস্তিত্বশীল হতে পারে সুপারপজিশন অবস্থায়। কিউবিট রিপ্রেজেন্ট করে অ্যাটমস, আয়নস, ফোটনস অথবা ইলেকট্রনস এবং তাদের সংশি-ষ্ট কন্ট্রোল ডিভাইসগুলোকে, যেগুলো একযোগে কাজ করছে একটি মেমরি ও একটি প্রসেসর হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য। যেহেতু একটি কোয়ান্টাম কমপিউটার একই সাথে একই সময়ে ধারণ করতে পারে এসব মাল্টিপল স্টেট বা বহু অবস্থা, সেহেতু এর কাজের ক্ষমতা হবে আজকের দিনের সবচেয়ে ক্ষমতাধর কমপিউটারের তুলনায় লাখ লাখ গুণ বেশি।

কিউবিটসের এই সুপারপজিশনই কোয়ান্টাম কমপিউটারকে দেয় এর অন্ত র্নিহিত প্যারালালিজম। পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড ডিউশের মতে, এই প্যারালালিজমই কোয়ান্টাম কমপিউটারকে ক্ষমতাধর করে তোলে একই সময়ে এক সাথে লাখ লাখ ক্যালকুলেশন সম্পাদনে, যেখানে আজকের দিনের একটি ডেস্কটপ কমপিউটার একবারে একটিমাত্র ক্যালকুলেশন করতে পারে। প্রচলিত যে কমপিউটার চালাতে পারে ১০ টেরাফ্লপ (প্রতি সেকেন্ডে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ফ্লয়েটিং পয়েন্ট অপারেশন), তার সমান হবে একটি ৩০ কিউবিটের কোয়ান্টাম কমপিউটার। আজকের ডেস্কটপ কমপিউটার যে গতিতে চলে, তা মাপা হয় গিগাফ্লপস একক (প্রতি সেকেন্ডে বিলিয়ন বিলিয়ন ফ্লয়েটিং পয়েন্ট অপারেশন)।

কোয়ান্টাম কমপিউটারে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আরেকটি বিষয়কে কাজে লাগানো হয়। এর নাম এনটেঙ্গলমেন্ট, যার উলে-খ এর আগে এ লেখায় রয়েছে। কোয়ান্টাম কমপিউটার ধারণার

(বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়)

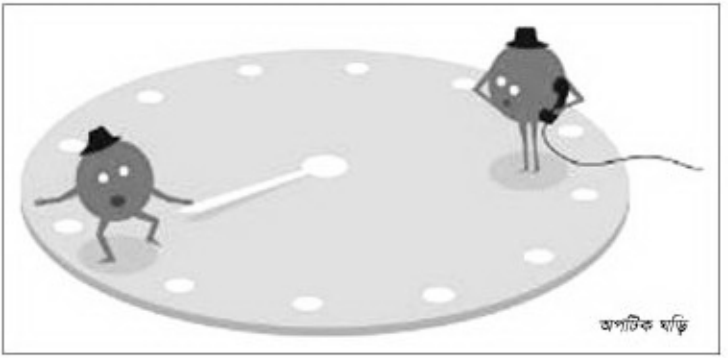

অপটিক ঘড়ি

কোয়ান্টাম কমপিউটিংয়ের অগ্রনায়কদের হাতে নোবেল পুরস্কার

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

একটা সমস্যা হচ্ছে– যদি আপনি সাবঅ্যাটমিক পার্টিকলের দিকে লক্ষ করেন, তবে দেখবেন এগুলো দম করে নিক্ষেপ করতে পারবেন, অর্থাৎ bump করতে পারবেন। ফলে পরিবর্তন করতে পারে এসবের ভ্যালু। এই ভ্যালু নির্ণয় করতে গিয়ে যদি সুপারপজিশনের অবস্থায় কিউবিট লক্ষ্য করেন, তখন কিউবিটের ভ্যালু হবে ০ অথবা ১। কিন্তু উভয় ভ্যালু হবে না। একটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল কোয়ান্টাম কমপিউটার তৈরি করতে বিজ্ঞানীদেরকে উদ্ভাবন করতে হবে এমন অপ্রত্যক্ষ পরিমাপ ব্যবস্থা, যেখানে এ ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা বিনাশ না হয়। অর্থাৎ সিস্টেমটির ইন্টিগ্রিটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে এনটেঙ্গলমেন্ট যোগায় একটি সম্ভাবনাময় সমাধান। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায়, যদি আপনি দু'টি অণুর ওপর বাইরের শক্তি প্রয়োগ করেন, তখন অণু দু'টি এনটেঙ্গল বা জটিল বিজড়িত অবস্থায় পড়তে পারে। তখন দ্বিতীয় অণুটি প্রথম অণুর গুণাগুণ ধারণ করতে পারে। অতএব যদি একা ছেড়ে দেয়া হয়, একটি অণু আবর্তিত হতে পারে সবদিকে। ঠিক যে সময়টায় এতে বাধা দেয়া হবে, সে সময়টায় এর থাকবে একটি আবর্তন গতি ও একটি ভ্যালু। এবং একই সময়ে দ্বিতীয় এনটেঙ্গল বা জটিল বিজড়িত অবস্থায় থাকা অণুটি বেছে নেবে উল্টা দিকের আবর্তন গতি ও ভ্যালু। এর ফলে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন এদের দিকে নজর না দিয়ে এদের কিউবিট ভ্যালু।

শেষ কথা

এটা নিশ্চিত, একটা সময় সিলিকনভিত্তিক কমপিউটিং স্থান নেবে ইতিহাসের পাতায়। আর এ জায়গাটি সদর্পে দখল করে নেবে কোয়ান্টাম কমপিউটিং। এবারের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সার্জি হ্যারোস ও ডেভিড ওয়াইনল্যান্ডের গবেষণা সাফল্য সে নিশ্চয়তাটুকুই আমাদের দিয়েছে। তাদের এই সাফল্য সূত্রে আমরা যে কোয়ান্টাম কমপিউটিংয়ের জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, তা আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনকে অভাবনীয় মাত্রায় পাল্টে দেবে। পরিবর্তীতে এ নতুন দুনিয়ায় সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে প্রয়োজন কোয়ান্টাম কমপিউটিং জগতের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। আমরা যদি কোয়ান্টাম কমপিউটিংয়ের জন্য নিজেদের দক্ষ প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত করে না তুলতে পারি, তবে আমাদের সামগ্রিক জীবনে নেমে আসবে মহাবিপর্যয়। এ সত্যটুকু মাথায় না রাখতে পারলে বিপর্যয় অনিবার্য। তাই এই সময় হচ্ছে, সে বিপর্যয় এড়ানোর ব্যাপারে সর্বোচ্চ সচেতনতা প্রদর্শনের সময়। সময়ের সাথে এগিয়ে চলাই হচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ ও একটি জাতির জন্য অপরিহার্য করণীয়। সে করণীয় যেনো আমরা ভুলে না যাই।